নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা

বাসবী চক্রবর্তী

'নারীবাদ' এই শব্দবন্ধটির সঙ্গে আজ আর কারুরই বোধহয় কোনও অপরিচয়ের আড়াল নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে, নারীবাদ আজ বহু চর্চিত বিষয়, বিতর্কিতও বটে। সমাজবিজ্ঞানের নানা শাখাতেই নারীবাদ বিষয় হিসেবে তার স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। অ্যাকাডেমিক পঠন-পাঠনের বাইরেও বৌদ্ধিক চর্চার ক্ষেত্রে নারীবাদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং এখনও চলেছে। অতীতমুখী হলে, নারীবাদের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসকে বোঝা যাবে। প্রায় দু'শতাব্দী ধরে নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে 'নারীবাদে'র গতিপথকে চিহ্নিত করেছেন এবং পুরুষের আধিপত্যবাদ থেকে নারীমুক্তির সঠিক দিশা নির্ণয়ে সময়ের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু সমস্যা হলো—কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় 'নারীবাদ'-কে? 'নারীবাদ' বলতে কী বোঝায়?

সমাজতন্ত্রবাদ, উদারনীতিবাদ কিংবা নারীবাদ—এই ধরনের 'বাদ'-যুক্ত ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ, কারণ সময়ের নিরিখে এই ধারণাগুলি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে কিংবা বলা যায়, সময়ের নিরিখে পাঠক বা তাত্ত্বিকেরা এই ধরনের "ism" বা 'বাদের' সঙ্গে যুক্ত করেন নতুন ধরনের প্রত্যয়। তাই নারীবাদের বিভিন্ন ধারাগুলিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—মতাদর্শের ভিত্তিকে আশ্রয় করে যেসব নারীবাদী চিন্তা গড়ে উঠেছিল, তারা 'নারীবাদ'কে যুক্ত করেছেন বিশেষ বিশেষ মতাদর্শের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। তাত্ত্বিকদের মধ্যেও চলেছে তর্ক-বিতর্ক এবং নিরন্তর বৌদ্ধিক যুক্তিবিন্যাস—'নারীবাদ' বলতে সঠিক অর্থে কী বোঝায়? নারীবাদ কি অন্য অনেক "ism" বা 'বাদ'যুক্ত শব্দ, যেমন মার্ক্সবাদ বা উদারনীতিবাদের মতো এক ধরনের তত্ত্ব? নাকি, নারীবাদ বলতে বোঝায় কেবলমাত্র আন্দোলনকে—যা পিতৃতন্ত্রের মোড়কে গড়ে ওঠা পুরুষের আধিপত্য থেকে নারীকে মুক্ত করতে চেয়েছিল? এইসব বৌদ্ধিক যুক্তিবিন্যাসের বাইরে গিয়ে এককথায় বলা যায়—নারীবাদ হচ্ছে মূলত নারীর মুক্তির জন্যে কিংবা নারীর সমানাধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা তত্ত্ব এবং একইসঙ্গে তার প্রয়োগগত দৃষ্টিভঙ্গি। নারীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি লিঙ্গবৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে নারী তার নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।

আলোচনার পূর্বসূত্র ধরেই উল্লেখ করা যায় যে নারীবাদের যথাযথ সংজ্ঞা এবং তার আলোচনার পরিধি নিয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে ঠিকই, কিন্তু বেশিরভাগ নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা নারীবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত কতকগুলি বিষয়ের ওপর

Scanned with CamScanner

আলোকপাত করেছেন : এগুলি হলো—(১) পিতৃতন্ত্র, (২) ব্যক্তি-পরিসর ও গণপরিসরের মধ্যে বিভাজন, (৩) জৈবিক লিঙ্গ ও সামাজিক লিঙ্গের মধ্যে বিভাজন, (৪) সমতা ও ভিন্নতা, (৫) যৌনতা এবং (৬) নারী ও অর্থনীতি।

(১) পিতৃতন্ত্র :

শব্দগত অর্থে, পিতৃতন্ত্র বলতে বোঝায় 'পিতার শাসন'। কারণ 'পিতৃতন্ত্রের' উৎস হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ "**প্যাটার**" (Pater)। কিন্তু নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা 'পিতৃতন্ত্রে'র এই সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করেন নি, তাঁরা বলেছেন ব্যাপক অর্থে 'পিতৃতন্ত্র' বলতে বোঝায় 'পুরুষের আধিপত্যবাদ', যা প্রতিক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ করতে চায় নারীকে। এই আধিপত্যবাদের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় পরিবারের চৌহদ্দিতে এবং এর বাইরে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, যেমন—শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্রের বিস্তৃত পরিসরে। এছাড়াও পিতৃতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে আইনিব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান এবং অবশ্যই প্রচারমাধ্যম। নারীবাদী তাত্ত্বিক সিলভিয়া ওয়ালবি তাঁর "*Theorising Patriarchy*" (১৯৯০) গ্রন্থে বলেছেন : "পিতৃতন্ত্র হচ্ছে সামাজিক কাঠামো আর রীতিনীতির এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিপীড়ন করে এবং শোষণ করে",[১] ওয়ালবি 'পিতৃতন্ত্র'কে একটি 'system' বা 'ব্যবস্থা' হিসেবেই দেখতে চান, কারণ তাঁর মতে, নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক পার্থক্যের কারণে স্বাভাবিক বৈষম্যের যে ধারণাটি প্রচলিত, যাকে বলা হয় 'জৈবিক নির্ধারণবাদ' (biological determinism)—সেই ধারণাকে উপেক্ষা করা যায়। পিতৃতন্ত্রকে, এভাবে একটি ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করলে, দেখা যাবে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত থাকে একটি মতাদর্শ—যা পুরুষকে নারীর তুলনায় শক্তিশালী ও দক্ষ বলে মনে করে, নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্যকে অনুমোদন করে এবং নারীকে পুরুষের সম্পত্তি বলে মনে করে। বিশিষ্ট তাত্ত্বিক গের্ডা লার্নার "*The Creation of Patriarchy*" (১৯৮৬) গ্রন্থে বলেছেন, পিতৃতন্ত্রের অধীনে পুরুষকে নারীর তুলনায় স্বাভাবিকভাবে উৎকৃষ্ট ভাবার জৈব নিয়ন্ত্রণবাদী সিদ্ধান্ত সেই প্রস্তরযুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একইভাবে চলে আসছে।[২] জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস্ পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর *The Origin of the Family, Private Property and State*'-গ্রন্থে (১৮৮৪)। এঙ্গেলস মনে করতেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্ভবের জন্যেই নারীর বশ্যতার সূত্রপাত হয়। এঙ্গেলসের ভাষায়, 'মাতৃস্বত্ব যেদিন পরাভূত হয় সেদিনই পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর পরাজয় ঘটে। গৃহের কর্তৃত্বও পুরুষের হাতে চলে যায়; নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং নারীর দাসত্বের সূচনা হয়'।[৩]

(২) ব্যক্তি-পরিসর ও গণ-পরিসরের মধ্যে বিভাজন :

পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গিকে চিহ্নিত করা হয় পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ব্যক্তি-পরিসর (Private sphere) এবং গণ-পরিসরের (Public sphere) মধ্যে বিভাজন বিদ্যমান। ব্যক্তিপরিসরে দেখা যায় আবেগের প্রাধান্য, অপরদিকে গণপরিসরে যুক্তির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে গড়ে তোলা এই বিভাজনকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নারীবাদী

Scanned with CamScanner

তাত্ত্বিকেরা। পরিবারের চৌহদ্দি নারীর নিজস্ব ক্ষেত্র এবং পরিবারের বাইরে বিস্তৃত পরিসর পুরুষের ক্ষেত্র—এই ধারণায় নারীবাদীরা বিশ্বাসী নন। তাঁদের মতে, এই বিভাজনের প্রয়াস যুক্তিবিবর্জিত। বস্তুত ব্যক্তিপরিসর সবসময়েই গণপরিসরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, রাষ্ট্রের মতো গণপরিসর অনেক সময়েই ব্যক্তি পরিসরকে নিয়ন্ত্রণ করে। নানাবিধ জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করে রাষ্ট্র জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, যদি ব্যক্তি পরিসর শুধুমাত্র নারীর নিজস্ব ক্ষেত্র হয়—তাহলে তা কি নারীর নিজস্বতা বা স্বাধীনতা রক্ষা করতে বা দিতে সক্ষম। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, পরিবারের চার দেওয়ালের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীর ওপর যে অনুশাসন থাকে, তা সবসময়েই নারীর নিজস্বতা, স্বাধীন ইচ্ছা বা অভিরুচির ওপর বাধা আরোপ করে। এই দিক থেকে বিচার করলে, ব্যক্তিপরিসর ও গণপরিসরের মধ্যে গড়ে তোলা বিভাজন হচ্ছে যুক্তিহীন। ১৯৬০ ও '৭০ দশকে সংঘটিত নারীবাদী আন্দোলনের শ্লোগান ছিল—'Personal is Political' অর্থাৎ ব্যক্তিগত ক্ষেত্র-ও রাজনীতি বহির্ভূত নয়। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাত্ত্বিকেরা 'রাজনীতি'র সংজ্ঞা ও আলোচনাক্ষেত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, যা নিশ্চিতভাবে ব্যক্তি পরিসর ও গণপরিসরের বিভাজনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এঁদের মতে, রাজনীতিকে যদি সংজ্ঞায়িত করা হয় অন্য মানুষের আচরণ বা কর্মনিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে, তাহলে রাজনীতি শুধু গণপরিসরের মধ্যে (যেমন রাষ্ট্র) আবদ্ধ থাকে না। বৈপ্লবিক নারীবাদী তাত্ত্বিক কেট্ মিলেট স্মরণ করিয়ে দেন, যেখানেই ক্ষমতা-সম্পর্ক বিরাজমান, সেখানেই রাজনীতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পরিবার ব্যক্তি পরিসর হলেও, পরিবার হয়ে উঠেছে ক্ষমতা-সম্পর্কের উদাহরণ, যেখানে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য বা প্রাধান্য বর্তমান।

(৩) জৈবিক লিঙ্গ ও সামাজিক লিঙ্গের মধ্যে বিভাজন :

'Sex' অর্থাৎ জৈবিক লিঙ্গ এবং 'Gender' বা সামাজিক লিঙ্গ—এই দুটি ধারণাকে আলাদা করে চিহ্নিত করাই হলো নারীবাদী তত্ত্বের প্রধান সূত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সমাজে নারীর ভূমিকা জৈবিকভাবে নির্ধারিত। জন্মমুহূর্ত থেকে নারী ও পুরুষ যেহেতু সহজাত শারীরিক বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র, সেইজন্যেই দুজনের সামাজিক ভূমিকাও স্বতন্ত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নারী পুরুষের মতো শারীরিকভাবে সবল নয়, তাই তার নিজস্ব ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকবে পরিবারের কাঠামোর মধ্যে এবং তার প্রধান কাজ হচ্ছে গার্হস্থ্য কর্ম সম্পাদন, সন্তানের জন্মদান ও প্রতিপালন করা। নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা এই 'জৈবিক নির্ধারণবাদ'কে আক্রমণ করেছেন। তাঁদের মতে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পৌরুষের সামাজিক পরিভাষাই নির্দেশ করে দেয় নারীর সামাজিক ভূমিকা। সমাজে গড়ে তোলা হয় পৌরুষ বা নারীত্বের আদর্শ—এই আদর্শের ছাঁচেই নারীকে স্থির করতে হয় তার আচার-আচরণ, ব্যবহারবিধি, আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ এই নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে তার "নারী" পরিচিতি সামাজিক স্বীকৃতি পেতে পারে না। এই আদর্শকেই বলা যায় 'জেন্ডার ইডিওলজি' বা 'লিঙ্গ মতাদর্শ'। ব্যারেট, ১৯৯৭ যে সমস্ত সামাজিক আচরণবিধির মাধ্যমে এই 'ইডিওলজি' বা 'মতাদর্শ' প্রযুক্ত হয় এবং কোনও ব্যক্তি-নারীকে তার নিজস্ব অবস্থানের গুরুত্ব বোঝাতে সাহায্য করে—সেইসব ব্যবহারবিধি, জীবনযাপন প্রণালী ও ভাবনা-চিন্তা

Scanned with CamScanner

একত্রিত হয়ে গড়ে ওঠে সমাজের "জেন্ডার ডিসকোর্স" বা 'লিঙ্গ-বয়ান'। এই কারণের জন্যেই নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা 'জেন্ডার'কে বলেছেন 'সোশ্যাল কনস্ট্রাক্ট' বা 'সামাজিক নির্মাণ'। নারী বা পুরুষের সামাজিক লিঙ্গ পরিচয়ের অর্থ হলো সমাজ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নারীত্ব বা পৌরুষের আদর্শ অনুসারে নারীর বা পুরুষের ভূমিকা পালন করা। তাই জন্মমুহূর্তে মানুষ শারীরিক যৌন বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় ঠিকই, কিন্তু তার জন্যে সে নারী বা পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হয় না; সমাজে বাস করতে করতেই সে ক্রমে ক্রমে সামাজিক অর্থে নারী বা পুরুষ হয়ে ওঠে। নারীর ভূমিকার এই সামাজিক নির্মাণ নিশ্চিতভাবেই মনে করিয়ে দেয় সিমোন দ্য বোভয়া-র অমোঘ উক্তি "One is not born but rather becomes a woman" অর্থাৎ "কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, বরং নারী হয়ে ওঠে'।[৪]

(৪) সমতা ও ভিন্নতা :

নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে একটি বিশেষ গোষ্ঠী নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা দাবি করেছেন এবং এঁরা দীর্ঘদিন ধরে নারীদের প্রতি যে বৈষম্য চলে আসছে, তার অবসান চেয়েছেন। সাম্য বা সমতার দাবির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শিক্ষার সম সুযোগ, সমান রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, গৃহের বাইরে কাজের সুযোগ, আইনি সাম্য ইত্যাদি। এঁদের লক্ষ্য হচ্ছে নারীকে ব্যক্তি হয়ে ওঠবার জন্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের মধ্যবর্তী পর্যায়ে কয়েকজন নারীবাদী তাত্ত্বিক নারীত্ব সম্পর্কে অন্য ধরনের ভাবনা-চিন্তা উপস্থিত করলেন। তাঁরা সাম্য বা সমতার পক্ষে ছিলেন না, বরং তারা নারীত্ব বিষয়ে ভিন্নতা'র ওপর জোর দিলেন। এঁদের মতে, সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালন, গার্হস্থ্য কর্ম সম্পাদন, পরিবারস্থ সদস্যের প্রতি যত্ন-ভালোবাসা-সহানুভূতি প্রদর্শনের মাধ্যমে নারী এক উচ্চতর গুণের অধিকারিণী, যা সমাজে পুরুষদের থেকে তাদের 'আলাদা' বা 'ভিন্নভাবে' স্থাপন করেছে। নারীত্ব সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের মতামত পোষণ করেন যেসব তাত্ত্বিক—তাদের বলা হয়ে সারবাদী (Essentialist) নারীবাদী। এঁদের মতানুসারে সমাজে নারী কেবল পুরুষদের থেকে আলাদা নয়, শ্রেণি এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে নারীরা নিজেদের মধ্যেও একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র। সারবাদী তাত্ত্বিকেরা নারীত্বের এই 'ভিন্নতা'র সপক্ষে উচ্চকিত ছিলেন, তাঁরা এই 'ভিন্নতা'কে নারীত্বের পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়ে ছিলেন। ১৯৭০'র দশকে সংঘটিত নারীবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য চালিত হয়েছিল পুরুষালী বৈশিষ্ট্য বা মূল্যবোধ অর্জন করার জন্যে নয়, বরং নারীর নিজস্ব ও ভিন্ন পরিচিতিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। এই "Difference Feminism" বা 'ভিন্নতাভিত্তিক নারীবাদ' নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গের সময়ে তাদের দাবির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

(৫) যৌনতা :

নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যৌনতা হচ্ছে একটি শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। নারীবাদী তাত্ত্বিক ম্যাকিনন বলেছেন—'Sexuality is to feminism what work is to Marxism, that which is most one's own, yet most taken away.'[৫] সিলভিয়া ওয়ালবির মতো তাত্ত্বিকেরা মনে করেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিদ্যমান

Scanned with CamScanner

অনেক ধরনের নিপীড়নের মধ্যে নারীর ওপর যৌন-আধিপত্যও হচ্ছে এক ধরনের নিপীড়ন। এই যৌন আধিপত্যের বিরুদ্ধে, নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা চেয়েছেন যে নারীর নিজের শরীর, যৌনতা, কামনা-বাসনা এবং প্রজনন—সবকিছুর ওপরেই নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। এমনকী তারা যৌনতার বিষয়টিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন যেখানে শুধু পুরুষ নয়, নারীও যৌনকর্মে পুরুষের মতোই সমভাবে অংশ নিতে পারবে। তাত্ত্বিকদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী অবশ্য বিপরীত-লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ও যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টিকে উপেক্ষা করে "Lesbianism" বা 'সমকামিতা'কে সমর্থন জানিয়েছেন। এই বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত নারীবাদীদের মতে, সমকামিতা শুধুমাত্র একটি যৌনকর্ম নয়, সমকামিতা হচ্ছে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ।

(৬) নারী ও অর্থনীতি :

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে-ও। ফলে অনেক কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় কম পারিশ্রমিক পায়। এছাড়া, কর্মক্ষেত্রে নারী নানাভাবে যৌন-হেনস্থা ও যৌন-নিগ্রহের শিকার হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চিরাচরিত ধারণা প্রচলিত যে নারী পুরুষদের তুলনায় কম দক্ষ, তাই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে তারা যোগ্য নয়। নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা এই চিরাচরিত ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। মার্ক্সীয় মতাদর্শে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমের বাজারে নারীকে গণ্য করা হয় সংরক্ষিত সৈন্যের মতো এবং যখন অর্থনৈতিক মন্দা উপস্থিত হয়, তখন তার কোপ গিয়ে পড়ে নারী-শ্রমিকদের ওপরে অর্থাৎ শ্রমের বাজার থেকে তাদের উৎখাত করা হয়। মার্ক্সবাদী-নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তারা বলেছেন, নারীর প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নের জন্যে দায়ী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং পিতৃতন্ত্র উভয়েই। ধনতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্র দুটিই একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় যে আদর্শে বিশ্বাস রাখা হয় তা হলো যে নারীর জীবনে মাতৃত্ব হচ্ছে সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা, কারণ নারী সন্তানের জন্ম দেয় এবং প্রতিপালন করে। ফলে নারী সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয় এবং মূলত গৃহকর্মে পূর্ণ সময়ের জন্যে নিযুক্ত হয়। অন্যদিকে সামাজিক উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে পুরুষ কর্মরত থাকে এবং পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে জীবনধারণের জন্যে অর্থনৈতিকভাবে নারীকে পুরুষের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। এভাবেই পিতৃশাসন নারীকে অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন করে রাখে। তাছাড়া নারীর গার্হস্থ্য শ্রমের কোনও অর্থনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। ফলে উদয়াস্ত পরিশ্রমের দ্বারা নারী যে গৃহকর্ম-সম্পাদন করে—কোনও অর্থমূল্যেই তাকে যাচাই করা হয় না। সংসার নির্বাহে পুরুষের অর্থনৈতিক অবদানই স্বীকৃত হয়। নারী থাকে পুরুষের অধীনস্থ, পুরুষের ওপর নির্ভরশীল—স্বাধীন সত্তাহীন। এর ফলে নারী দ্বৈতশাসনের শিকার হয়। একদিকে আধিপত্যকারী শাসকশ্রেণী অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে শোষিত জনগণের অংশ হিসেবে এবং অন্যদিকে পরিবারের পুরুষদের দ্বারা।

নারীবাদের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করার পর আমরা বলতে পারি, নারীবাদকে ঘিরে যেমন গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন চিন্তাধারা, তেমনি নারীবাদ

Scanned with CamScanner

হয়ে উঠেছিল নারীর অধিকার আদায় ও দাবি-দাওয়া প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্দোলন-ও—যাকে বলা হয় নারীবাদী আন্দোলন। সময়ের হিসেবে এই আন্দোলন কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। এই পর্যায়গুলিকে বলা হয় 'নারীবাদের তরঙ্গ' (Wave of Feminism)। নারীবাদের উদ্ভব ও বিকাশের দিকে তাকালে দেখা যাবে এ'পর্যন্ত তিনটি তরঙ্গে বিভাজিত নারীবাদের ইতিহাস—নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গ এবং তৃতীয় তরঙ্গ। ইউরোপে গণতান্ত্রিক অধিকার ও শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন প্রসারিত হবার পাশাপাশি নারীদের আন্দোলন-ও গড়ে ওঠে। ইউরোপ ও আমেরিকায় নারী-আন্দোলন গড়ে ওঠে প্রতিবাদী আন্দোলন হিসেবে, যার পিছনে সক্রিয় কারণগুলি ছিল—বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায় যেমন শিক্ষার অধিকার, সমবেতন, ক্রীতদাসপ্রথার অবসান, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অধিকার ইত্যাদি। এই পর্যায়ে নারীর বৈষম্যমূলক অবস্থানের কথা তুলে ধরা হয় বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে। জেন ফ্রিডম্যানের (২০০২) মতে, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকায় নারীর অধিকার আদায়ের দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা ছিল ১৮৪৮ সালের সেনেকা ফলস কনভেনশানের ফলশ্রুতি। এর পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এলিজাবেথ কেডি স্টানটন ও সুসান বি. অ্যান্টনি-র প্রচেষ্টায় 'নেশনস উওম্যান সাফ্রেজ অ্যাসোসিয়েশন'। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটেনে-ও সংগঠিত নারী আন্দোলন প্রসার লাভ করে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মূলত মধ্যবিত্ত নারীগোষ্ঠীর নেতৃত্বে তৈরি হয় "লংহ্যাম প্রেস গ্রুপ"—যা নারীদের সমস্যাগুলিকে যথাযথভাবে তুলে ধরার মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। এই গোষ্ঠীর সহায়তায় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম নেয় "সোসাইটি ফর প্রোমোটিং দ্য এমপ্লয়মেন্ট অফ উইমেনস"। এখানে উল্লেখ্য, এই নারী সংগঠনটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে যখন ১৮৬৭ সালে হাউস অফ কমন্স নারীর ভোটাধিকারের প্রথম প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে। ভোটাধিকার আদায়ের দাবিতে সংগঠিত আন্দোলন চরম রূপ নেয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে "উওম্যান'স স্যোশাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইউনিয়ন" গঠিত হবার পর।

নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ ও তৎকালীন সংঘটিত নারী আন্দোলন চালিত হয়েছিল মূলত সমান অধিকার (নারী ও পুরুষের) আদায়ের লক্ষ্যে। নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গকে চিহ্নিত করা যায় 'ফেমিনিজম অফ উইমেন'স লিবারেশন বা নারীর স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সংঘটিত আন্দোলন হিসেবে। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দ্বিতীয় তরঙ্গ ছিল প্রথম তরঙ্গর তুলনায় স্বতন্ত্র এবং প্রকৃতির দিক থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। বিংশ শতাব্দীর ষাট এবং সত্তরের দশকে দ্বিতীয় তরঙ্গের পর্যায়ে নারী আন্দোলন নিয়ে আসে নতুন উদ্দীপনা ও নতুনতর ভাবনা-চিন্তা। ইউরোপ ও আমেরিকায় ১৯৬০-র দশকে নারী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা ও শক্তির উৎস ছিল ইউরোপের ছাত্র-আন্দোলন, 'সিভিল রাইটস' আন্দোলন এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। মনে রাখতে হবে, নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ নারী ও পুরুষের তথাকথিত স্বাভাবিক বিভাজন নিয়ে প্রশ্ন তোলে নি, এই সময়কার দাবি-দাওয়ার মধ্যে ছিল নারীর জন্যে পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার। কিন্তু নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের সময়ে নারী-পুরুষের এই বিভাজনের কারণগুলির ওপরে আলোকপাত করা হলো। নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা নারীর প্রতি বৈষম্য ও নারীর হীন অবস্থানের জন্যে সরাসরি দায়ী করলেন পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে। নারীবাদীদের মধ্যে একটি বিশেষ গোষ্ঠী অসমকামিতা বা

Scanned with CamScanner

নারী-পুরুষের মধ্যে প্রচলিত যৌন-সম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, এমনকী পুরুষকে চিহ্নিত করলেন শত্রু হিসেবে। আমেরিকায় কয়েকটি বৈপ্লবিক নারীবাদী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে এই সময়ে—যারা নারীমুক্তি বা নারী স্বাধীনতার জন্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা মূলত নারীদের মধ্যে তাদের অবস্থান বিষয়ে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ তারা অনুধাবন করতে পারে নারীর সমস্যা কোন একক ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, নানাধরনের প্রতিষ্ঠান ও ব্যবহারবিধি যেমন বিবাহ, যৌনঅভ্যাস, পারিবারিক রীতি-নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে পুরুষ নারীর ওপর নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ফলে এইসব গোষ্ঠী প্রচার করে যে নারীদের মধ্যে যদি রাজনৈতিক সচেতনতা জাগিয়ে তোলা যায়, তাহলেই হয়তো পুরুষ-আধিপত্যের থেকে মুক্তি সম্ভব। নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে যারা উদারনৈতিক ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাদের চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ পেতে লাগল প্রকাশিত পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার নানা প্রতিবেদনে। *"Feminine Mystique"*-এর স্রষ্টা তাত্ত্বিক বেটি ফ্রায়ডান নারী-আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী-ও ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি গড়ে তোলেন "ন্যাশানাল অরগানাইজেশান ফর উইমেন"। নারীর সমানাধিকারের জন্যে দাবি-দাওয়া পেশ করার ক্ষেত্রে এই সংগঠনটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। পূর্বেই উল্লেখিত যে সমাজে নারীর অবস্থানের জন্যে সক্রিয় কারণগুলিকে নিয়ে নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল নানা ধরনের বিভাজন ও ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা। এই সময়ে প্রশ্ন উঠেছিল নারীবাদী তাত্ত্বিকদের ব্যক্তিগত অবস্থানের বিষয়টি নিয়েও। নারীবাদীদের মধ্যে এই বিভাজনকে ভিত্তি করে অফেন্ড (১৯৮৮) দু'ধরনের নারীবাদের কথা বলেছেন—ব্যক্তিকেন্দ্রিক নারীবাদ (Individualist feminism) এবং সম্পর্কভিত্তিক নারীবাদ (Relational feminism)। প্রথমটির ক্ষেত্রে অফেন্ড জোর দিয়েছেন মানবাধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে পরিবার তথা কর্মক্ষেত্রে নারীর সমান সুযোগসুবিধা পাবার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যদিকে, কট (১৯৮৯) নারীবাদের শ্রেণিবিভাজন করেছেন পুরুষের সঙ্গে নারীর একরূপতা ও ভিন্নতার ভিত্তিতে। এছাড়া, আরও একধরনের বিভাজন দেখা যায় নির্মাণবাদী (Constructionist) ও সারবাদী (Essentialist) দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে।

মূলত নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গকে প্রতিস্পর্ধা (challenge) জানিয়ে বিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকে ইউরোপে এক বিশেষ ধরনের নারীবাদী চিন্তার উদ্ভব হয়, যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে উত্তর-নারীবাদ বা Post-feminism হিসেবে। ১৯৬০, '৭০ ও '৮০র দশকে গড়ে ওঠা নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের ভাবনা-চিন্তা বা ধ্যান-ধারণাকে উত্তর-নারীবাদীরা উপেক্ষা করেছেন। এঁদের মতে, যেহেতু নারীবাদীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া যেমন ভোটাধিকার, শিক্ষার সুযোগ, কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ, ইত্যাদির প্রাপ্তি ঘটেছে, তাই আর কোনও নারীবাদী আন্দোলন সংঘটিত হবার প্রয়োজন নেই। এছাড়া, এই গোষ্ঠী নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গকে তেমন ফলপ্রসূ বলে মনে করেননি,কারণ ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শে বিভাজিত এই পর্যায় কোনও একক, স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট মতাদর্শ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। উত্তর-নারীবাদীরা নারী-সত্তার একেবারে ভিন্ন একটি ধারণা তুলে ধরলেন—যারা বিশেষত যুবতী-নারীর শরীরের যৌন আবেদনকে পুরুষ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলেন। গণমাধ্যমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর এই শরীরী-আকর্ষণ উপস্থাপিত হতে

Scanned with CamScanner

লাগলো। বিশেষ শ্রেণির এই নারীরা চিহ্নিত হলেন "spice girls" রূপে। বলা হলো নারী কেবল পুরুষের যৌন আকর্ষণের 'object' বা লক্ষ্য নয়, বরং নারী তার শরীরী আবেদন দিয়ে 'sexual subject' হিসেবে পুরুষকে বশীভূত করতে পারে। তাই নারীকে 'নিষ্ক্রিয়' বা 'দুর্বল' ভাবার কোন কারণ নেই। ফ্যাশান ও সৌন্দর্য গড়ে তোলার বিবিধ শিল্প'কে তারা একটি ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করলেন, যেখানে নারীর এই ধরনের স্বাধীনতাকে প্রকাশ করা যায় এবং পুরুষের ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একটি বিকল্প নির্মাণ হয়ে উঠতে পারে এই ধরনের প্রয়াস। উত্তর-নারীবাদ, যাকে বলা হয়েছে—"spice girls' postfeminism" সমালোচিত হয়েছে তাত্ত্বিক জারমেইন গ্রিয়ারের দ্বারা, যিনি ছিলেন নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের পর্যায়ে একজন উল্লেখযোগ্য নারীবাদী। তাঁর মতে, এই ধরনের নারীবাদ পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে নারীর যৌনতাকেই তুলে ধরতে চাইছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি নারীর যৌনতাকে মাধ্যম করে তাদের উৎপাদন-সামগ্রীর ভোক্তারূপে উপস্থাপিত করছে। গ্রিয়ারের মতে, উত্তর-নারীবাদ হচ্ছে ভোগবাদী সমাজে একটি বিপণনধর্মী ধারণা, যা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। অন্যদিকে তাত্ত্বিক সুসান ফালুদি স্পষ্টভাবেই আক্রমণ করেছেন উত্তর-নারীবাদকে। ফালুদির মতে, নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের সময় নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার যে-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, উত্তর নারীবাদ তার বিরুদ্ধে একটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া।[৬]

উত্তর-নারীবাদকে, অবশ্য, এই নেতিবাচক অর্থে গ্রহণ না করে অন্যভাবেও দেখা হয়। নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের বিরুদ্ধে উত্থিত প্রতিক্রিয়া হিসেবে নয়, কয়েকজন নারীবাদী "Post feminism" বা উত্তর-নারীবাদের অন্য একটি দৃষ্টিকোণ তুলে ধরেছেন। এই দৃষ্টিকোণে 'উত্তর-নারীবাদ'কে দেখা হয়েছে পূর্ববর্তী নারী-আন্দোলনের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ারূপে, যা চিহ্নিত হয়েছে "feminism with difference" বা 'ভিন্নতা যুক্ত নারীবাদ' হিসেবে। উত্তর-নারীবাদের ধারণার ব্যাপ্ত পরিসরে যুক্ত হয়েছে নারীবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহুত্ববাদী চিন্তা-ভাবনা (সদর্থক অর্থে 'উত্তর-নারীবাদ' একদিকে যেমন দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী চিন্তার সীমাবদ্ধতাগুলিকে অতিক্রম করতে চায়, অন্যদিকে তেমনি পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী নারীবাদী চিন্তাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে চায়, যুক্ত করতে চায় নতুন মাত্রা)। তবে ইউরোপ-কেন্দ্রিক শ্বেতকায়, মধ্যবিত্ত-মহিলাদের দ্বারা চালিত নারী-আন্দোলনকে 'উত্তর নারীবাদ' সমর্থন করে নি। বরং বলা যায় উত্তর-নারীবাদ ছিল এই ধরনের নারী-আন্দোলনের বিরুদ্ধে এক ধরনের সমালোচনা, যদিও তা নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের অবদানকে অস্বীকৃতি জানায় নি। এইভাবে দ্বিতীয় তরঙ্গের ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে বহুত্ববাদী চিন্তাভাবনাকে ভিত্তি করে নারীবাদের যে নতুন দিশা গড়ে উঠল—তাকেই বলা হয়েছে 'নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ' (Third Wave Feminism)। এর সংগঠিত রূপ দেখা গেল আমেরিকায়, যখন রেবেকা ওয়াকারের নেতৃত্বে ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে উঠল 'থার্ড ওয়েভ উওমেনস গ্রুপ'। নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গের সময়ে গুরুত্ব পেল লিঙ্গবৈষম্য ও নারী-নিপীড়নের মতো বিষয়। কীভাবে এই বৈষম্য ও নিপীড়নের অবসান করা যায় সেই লক্ষ্যেই চালিত হয়েছিল তৃতীয় তরঙ্গের সময়কার সংঘটিত আন্দোলন। এখানে উল্লেখ্য, ভাবনা-চিন্তা ও ধারণার দিক থেকে উত্তর-নারীবাদ ও তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদের মধ্যে তেমন

Scanned with CamScanner

ফারাক পরিলক্ষিত হয় না। তাই সমসাময়িক মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার সঙ্গে সংগতি রেখে নারীবাদের আলোচনার পরিধিতে স্থান করে নেয়—মনোসমীক্ষণ, উত্তর কাঠামোবাদ, উত্তর আধুনিকতা ও উত্তর ঔপনিবেশিকতার মতো বিষয়গুলি।

২

নারীবাদের তিনটি তরঙ্গ—যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গের সময়ে গড়ে উঠেছিল নারীবাদের বিভিন্ন ধারা। এর মধ্যে প্রধান ধারাগুলি হলো উদারনৈতিক নারীবাদ, মার্ক্সীয় নারীবাদ, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ, বৈপ্লবিক নারীবাদ ও সাংস্কৃতিক নারীবাদ (Liberal Feminism, Marxist Feminism, Socialist Feminism, Radical Feminism ও Cultural Feminism)। এছাড়াও, পরবর্তীকালে নারীবাদ নিয়ে নিরন্তর চর্চা, গবেষণার ফলে নারীবাদের প্রধান ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক নারীবাদ, উত্তর-আধুনিক নারীবাদ, এবং পরিবেশপ্রধান নারীবাদ (Psycho Feminism, Post Modern Feminism, ও Eco-Feminism)। এই ধারাগুলির ওপর আলোকপাত করলে বোঝা যাবে এগুলির বৈশিষ্ট্য, মতাদর্শগত ভিত্তি এবং এই ধারাগুলির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের ধ্যান-ধারণা।

উদারনৈতিক নারীবাদ :

উদারনৈতিক নারীবাদের বৌদ্ধিক অনুপ্রেরণার উৎস ছিল উদারনৈতিক রাজনৈতিক দর্শন, যা গড়ে উঠেছিল টমাস হবস্, জন লক, জেরেমি বেন্থাম এবং জেমস মিলের উদারনীতিবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতে।

উদারনৈতিক রাষ্ট্রীয় দার্শনিকদের তত্ত্বকে বলা হয় 'ধ্রুপদি উদারনীতিবাদ'। ধ্রুপদি উদারনীতিবাদীদের মতে, মানুষ ঈশ্বর-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং মানুষ হচ্ছে সক্রিয় যুক্তিবাদী ও স্বাধীন, যে ইচ্ছানুসারে সরকার গঠন করতে পারে এবং সমান অধিকার ও সুযোগ ভোগ করতে পারে। এই সব অধিকার ও সুযোগসুবিধা ঈশ্বর-প্রদত্ত নয় বা কোন উচ্চতর কর্তৃত্বের প্রদত্তও নয়, এগুলি মানুষ জন্মলগ্ন থেকেই প্রকৃতির কাছ থেকে পায়। উদারনৈতিক নারীবাদীরা এই ধ্রুপদি উদারনীতিবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তবে 'মানুষ' বলতে শুধু 'পুরুষ' নয়, নারীও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত—এই বিষয়টির ওপর জোর দিয়ে পুরুষের সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার দাবি করেন। তাদের উত্থিত দাবির মধ্যে ছিল নারীর ভোটাধিকার, আইনি অধিকার, শিক্ষার অধিকার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবার অধিকার।

উদারনৈতিক নারীবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর নারীবাদী মেরি উলস্টোনক্র্যাফট, উলস্টোনক্র্যাফটের সময়ে নারীর ভোটাধিকার ছিল না, সম্পত্তির অধিকারও ছিল না, এমনকী সরকারি শিক্ষায়তনে, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা ছিল। মেরী-ই সর্বপ্রথম নারীর ভোটাধিকারের বিষয়টি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *'The Vindication of the Rights of Women'*-গ্রন্থে তিনি কতগুলি জরুরি বিষয় তুলে ধরলেন। তাঁর মতে, নারীর ভোটাধিকার অর্জিত না হলে, গণতন্ত্র কখনও 'সার্থক' গণতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে না। তিনি 'গণ পরিসরের' সঙ্গে সম্পর্করহিতভাবে নারীর 'ব্যক্তি পরিসরের' মধ্যে আবদ্ধ

Scanned with CamScanner

থাকাকে সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, ব্যক্তি পরিসরের বাইরে গিয়ে যখন নারী বাইরের কাজে যোগ দেবে এবং শিক্ষার সুযোগ পাবে, তখন নারী যথাযথ মর্যাদায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। মেরি উলস্টোনক্র্যাফটের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সমসাময়িককালের নারীবাদীদের প্রভাবিত করেছিল। এর পরবর্তী সময়ে নারীর সপক্ষে আইনি ও রাজনৈতিক অধিকারের দাবি জানালেন এমন একজন তাত্ত্বিক, তিনি পুরুষ হয়েও নারীবাদী। তাঁর নাম জন স্টুয়ার্ট মিল। মিলের মতে সমাজে নারীর পরাধীন অবস্থার জন্যে 'নারী-প্রকৃতি' দায়ী নয়। নারী দুর্বল, ভীরু ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের কারণে পুরুষের তুলনায় হীন ভাবারও কোন কারণ নেই। নারীর অবস্থার জন্যে দায়ী সমাজে প্রচলিত নানাবিধ প্রথা ও আইনী ব্যবস্থা। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *'The Subjugation of Women'*-গ্রন্থে তিনি ইংলন্ডে নারীর অবস্থানের চিত্রটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন। মিল বললেন, শিক্ষার অধিকার, সমান আইনি ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পুরুষ নারীকে পদানত করে রেখেছে, ফলে নারীর কোন স্বাধীন ইচ্ছা নেই। নারীর অবস্থার উন্নতির জন্যে মিল দাবি করলেন পুরুষের সমান পূর্ণ আইনি তথা রাজনৈতিক অধিকার। উনবিংশ শতকের নারীবাদী ফ্রান্সিস রাইট জোর দিলেন নারীর মধ্যে যুক্তি ও বাস্তবসম্মত চিন্তাধারা গড়ে তোলার ওপর, যাতে তারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রথা, ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে যে-কোন বিষয়কে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। রাইটের মতে, ধর্ম এবং প্রতিষ্ঠান সব-সময়েই নারীকে অবদমিত করতে চায়। নারীবাদী তাত্ত্বিক সারা গ্রিমকে বললেন যে পুরুষের সমান অধিকার প্রাপ্তিই যথেষ্ট নয়, নারীর অবস্থার উন্নতির জন্যে সামাজিক পরিবর্তনও দরকার। নারীর শিক্ষার অধিকার ও সমান বেতন পাবার অধিকারকে সমর্থন জানিয়ে গ্রিমকে জোর দিয়েছিলেন নারীর শিক্ষার অধিকারের ওপর, কারণ তাঁর মতে, শিক্ষা ছাড়া নারী কখনোই তার বৌদ্ধিক দক্ষতাকে আয়ত্ত করতে পারবে না। উনবিংশ শতকের অপর তাত্ত্বিক, এলিজাবেথ কেডি স্ট্যানটন নারীর ভোটাধিকার অর্জনকে নারীর 'স্বাভাবিক অধিকার' বলে বর্ণনা করেছেন। নারীর ভোটাধিকার লাভের সপক্ষে জোরালো যুক্তিস্থাপন করে স্ট্যানটন বলেছেন, ভোটাধিকারহীন নারীর অবস্থা হচ্ছে 'taxation without representation' অর্থাৎ রাজনৈতিক অধিকারহীন নারীকে শুধু করদানের বোঝা বইতে হবে। একই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন উনবিংশ শতকের অপর একজন তাত্ত্বিক, সুসান বি অ্যান্টনি। অ্যান্টনির ধারণায়, ভোটাধিকার হচ্ছে নারীর স্বাভাবিক অধিকার, যা নারীর ওপর 'পুরুষের প্রভুত্ব' এবং পরিবারের চৌহদ্দিতে 'নারীর দাসত্বের' অবসান ঘটাতে সক্ষম।

উদারনৈতিক নারীবাদ প্রসারের প্রথম পর্বটিতে আমরা পাই সেইসব তাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদদের, যাঁরা ধ্রুপদি উদারনৈতিক ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের মূল দাবি ছিল নারীর সমানাধিকার, ভোটাধিকার, শিক্ষার সুযোগলাভ ইত্যাদি, কিন্তু এরা পিতৃতন্ত্র বা পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিস্পর্ধা জানাতে পারেন নি। বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর মধ্যেই এরা নারীর সমানাধিকার দাবি করেছেন। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উদারনৈতিক নারীবাদী কণ্ঠস্বর আবার উত্থিত হয় বেটি ফ্রায়ডান (১৯৬৩), র‍্যাডক্লিফ রিচার্ডস (১৯৮২), সুসান মোলার ওকিনের (১৯৮৯) দ্বারা। এঁরা প্রধানত বিংশ শতকের কল্যাণকর উদারনীতিবাদী তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এঁরা চেয়েছিলেন রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা এবং এদের দাবির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল নারীর

Scanned with CamScanner

জন্যে শিক্ষা, কল্যাণকর ব্যবস্থা, আইনগত নিরাপদ গর্ভপাতের ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সম্পদের সুষম বণ্টন, মানবাধিকার, শ্রম আইন প্রভৃতি। প্রকৃত প্রস্তাবে, লিঙ্গ-বৈষম্যকে সমাজে নানাস্তরে ত্বরান্বিত করে তুলছিল যেসব পারিপার্শ্বিক সামাজিক তথা রাজনৈতিক ঘটনা যেমন জাতিবৈষম্য, বিশ্ববাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ ও সামাজিক ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাস, তার সঙ্গে সংগতি রেখে এই পর্যায়ভুক্ত উদারনৈতিক নারীবাদীরা তাদের দাবি-দাওয়ার বিষয়গুলি নির্ধারণ করেছিলেন এবং প্রসারিত করেছিলেন। তাত্ত্বিক বেটি ফ্রায়ডান দাবি করেছিলেন শিশু-রক্ষণাবেক্ষণের উন্নততর ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা। এছাড়া, তিনি চেয়েছিলেন ব্যক্তিগত পরিসরে গার্হস্থ্য দায়-দায়িত্বে পুরুষের নিযুক্তি এবং কর্মক্ষেত্রে কাজের চিরাচরিত কাঠামোর পুনর্বিন্যাস। অন্যদিকে, র‍্যাডক্লিফ রিচার্ডস ও সুসান মোলার ওকিন বিংশ শতকের প্রখ্যাত রাষ্ট্রীয়-দার্শনিক জন রলসের 'ন্যায়বিচার তত্ত্বে'র দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। *"Skeptical Feminist"* গ্রন্থে (১৯৮২) রিচার্ডস ন্যায়-বিচারের এমন একটি তত্ত্ব গঠনের কথা বললেন যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়েই তাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীকে বিকশিত করতে পারে। ওকিন (১৯৮৯) চেয়েছিলেন পরিবারের মতো ব্যক্তি পরিসরকে ন্যায়-বিচারের ওপর স্থাপন করতে, যাতে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান-দায়িত্ব ভাগ করে নিতে সক্ষম হয়। শিশু-রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষার সুযোগের মতো বিষয়ে রিচার্ডস ও ওকিন দুজনেই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। উদারনৈতিক নারীবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত তাত্ত্বিকেরা পশ্চিমী উদারনৈতিক দর্শনের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে তাঁদের উদারনৈতিক চিন্তাধারাকে স্থাপন করতে আগ্রহী ছিলেন। প্রথম পর্যায়ের উদারনৈতিক তাত্ত্বিকদের মতো এঁরা শুধু সমানাধিকার আদায় করতে চাননি, পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুসারে এঁরা রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে নারীর জন্যে প্রয়োজনীয় কল্যাণকর ব্যবস্থার কথা বলেছেন।

মার্ক্সীয় নারীবাদ :

মার্ক্সীয় নারীবাদ ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ—নারীবাদের এই দুটি ধারাই ১৯৬০-এর দশকে প্রসারলাভ করে। যদিও অনেক সময় মার্ক্সীয় ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদকে সমান্তরালভাবে দেখা হয়, কিন্তু ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মার্ক্সবাদী ধ্যানধারণা সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ গ্রহণ করলেও, অনেকক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা ভিন্নমত পোষণ করেন। তাই সমাজতান্ত্রিক নারীবাদকে নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করাই যুক্তিসংগত।

মার্ক্সীয় শ্রেণি-বিশ্লেষণ এবং নারীর প্রতি বৈষম্যের কারণে নারীবাদীদের প্রতিবাদ এই দুটি বিষয়কে একত্রিত মার্ক্সবাদী নারীবাদের ধারা গড়ে উঠেছে, যার মূলে রয়েছে কার্ল মার্ক্স ও তাঁর সহযোগী ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস প্রণীত তত্ত্ব। ফ্রেডেরিক এঙ্গেলসের লেখা *"The Origin of the Family, Private Property and State"*– (১৮৮৪) এই গ্রন্থটি থেকেই মার্ক্সবাদী নারীবাদীরা তাঁদের ধ্যান-ধারণা গড়ে তোলায় অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। এঙ্গেলসের মতে, শ্রেণি বিভাজন ও নারীর বশ্যতা দুটিই নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। এঙ্গেলস সামাজিক বিবর্তনের তিনটি স্তর নির্দেশ করেছেন—আদিমতা, বর্বরতা ও সভ্যতা। আদিম মানবের জীবনধারণের উপায় ছিল পশুপালন ও খাদ্য সংগ্রহ। তখন বিবাহ বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনো ধারণা ছিল

Scanned with CamScanner

না। বংশধারা গড়ে উঠতো মায়ের পরিচয়ের সূত্রে। বর্বরতার পর্যায়ে পশুপালন ও চাষবাস শুরু হয়। ফলে গৃহকর্ম সম্পাদন ও শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নারীর স্থান নির্ধারিত হয় গৃহে। এইভাবে ক্রমশ বৈষম্যভিত্তিক শ্রমবিভাজনের সূত্রপাত হয়। তবে গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নারীর হাতে ছিল। এর পরবর্তী পর্যায়ে ক্রীতদাস প্রথার সূচনা হয়। ফলে এই সময় থেকে পুরুষের আধিপত্য বিস্তৃত হতে শুরু করে। পশু ও ক্রীতদাসের ওপর পুরুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধনসম্পদও বাড়তে থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয় এই পর্যায়েই। উত্তরাধিকার প্রথা বলবৎ করার জন্যে মাতৃস্বত্ব কেড়ে নেওয়া হয় নারীর কাছ থেকে। নারীকে করা হয় গৃহবন্দি এবং তার যৌনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ফলে এই সময় থেকেই পিতৃতন্ত্র জারি হয় এবং নারীর এক-বিবাহ প্রথার প্রচলন ঘটে। নারী অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এঙ্গেলস বলেছেন, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সন্তানকে হস্তান্তর করার জন্যেই নারী হয়ে ওঠে সন্তান-উৎপাদনের যন্ত্র এবং গৃহমুখী। বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের যৌনতার এই দ্বিমুখী রূপের সূত্রপাত ঘটে এই সময় থেকেই, পরে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এক-বিবাহ ভিত্তিক পরিবার শেষ পর্যন্ত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পরিণত হয়। এই পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নারীর গৃহশ্রমকে গণ্য করা হয় ব্যক্তিগত কাজ বলে এবং বৃহৎ সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে নারীকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এঙ্গেলস্ ও তাঁর অনুগামী অন্য মার্ক্সবাদীরা মনে করেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত হলে এবং নারী শ্রমশক্তির অংশ হয়ে উঠলেই পিতৃতন্ত্রের অবসান হবে। তাঁদের মতে, সমাজে দ্বন্দ্বের মূল কারণ হলো শ্রেণিবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে গড়ে-ওঠা এই শ্রেণি-বৈষম্যের অবসান হবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধনের মাধ্যমে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে শ্রেণি-বৈষম্যের পাশাপাশি লিঙ্গ-বৈষম্যও মুছে যাবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ যতদিন না গড়ে ওঠে, ততদিন শ্রেণি-সংগ্রামে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করাই হচ্ছে নারীমুক্তির পথ।

মার্ক্সীয় নারীবাদীরাও মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যেই তাদের যুক্তিকে তুলে ধরেছেন। তারা মনে করেন যে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা নিজের প্রয়োজনেই নারীকে গৃহমুখী ও গৃহবন্দি করতে চায়, কারণ সন্তানের প্রতিপালন ও পরিচর্যার মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে নিয়োজিত শ্রমিকের দক্ষতা, সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে নারীর মাতৃত্ব। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম দক্ষ ও সুস্থ শ্রমিকের সরবরাহ অব্যাহত থাকে। এছাড়া, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যখন কোনও সংকট দেখা দেয়, শ্রমশক্তির অভাব ঘটে, তখন নারী কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে "Reserve army" বা 'সংরক্ষিত সৈন্যের' কাজ করে। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির মাধ্যমেই নারীমুক্তি সম্ভব বলে মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকেরা মনে করেন।

মার্ক্সীয় নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী, সমসাময়িক পুঁজিবাদী শ্রেণিব্যবস্থার মধ্যে 'লিঙ্গ-সম্পর্ক' (gender-relation) খুঁজতে প্রয়াসী। এই গোষ্ঠীকে বলা হয় 'সমসাময়িক মার্ক্সীয় নারীবাদী' (উইলসন, ১৯৯৩; শেল্টন এবং অ্যাগার, ১৯৯৩; ফলব্রে, ১৯৯৩ প্রমুখ)। সমসাময়িক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত পুরুষ শিল্পোৎপাদনের প্রতিষ্ঠানিক সম্পদকে যেমন করায়ত্ত করার কৌশল জানে, তেমনি জানে কীভাবে সমশ্রেণিভুক্ত নারীর ওপর প্রাধান্য ও আধিপত্য স্থাপন করা যায়। তাই

Scanned with CamScanner

বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত নারী হয়ে ওঠে বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত পুরুষের নিজস্ব সম্পত্তি। পরবর্তীকালে বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত নারী তার পুত্রসন্তানকে এমনভাবে প্রতিপালন করে, যাতে তারা পিতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদগুলির উত্তরাধিকারী হতে পারে। পুরুষকেও এইসব নারী যোগায় সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক পরিষেবা এবং তার পরিবর্তে এইসব পুরুষদের কাছ থেকে পায় বৈভবপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ-সুবিধা। এইভাবে বুর্জোয়াশ্রেণিভুক্ত নারী ও পুরুষদের মধ্যে এক ধরনের লেনদেন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে (রুবিন, ১৯৭৫)। মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক রোজা লুক্সেমবার্গ বুর্জোয়াশ্রেণিভুক্ত নারীদের বলেছেন, "The parasite of a parasite" বা 'পরজীবীর ওপর নির্ভরশীল পরজীবী' (ম্যাকিনন, ১৯৮২)।

সমসাময়িক মার্ক্সীয় নারীবাদীরা তাদের চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছেন 'বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্বের' ক্ষেত্রে। মূলত মার্ক্সীয় তত্ত্বকে ভিত্তি করেই প্রখ্যাত তাত্ত্বিক ইমানুয়েল ওয়ালেরস্টেইন এই বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব' উপস্থাপন করেন। এই তত্ত্বে অনুসৃত 'কেন্দ্রীয়' (core) ও 'প্রান্তিক' (periphery) অবস্থানের মডেলটি বহু-আলোচিত। মূলত এই ধারণা অনুসরণ করে নারীবাদীরা বলতে চেয়েছেন সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান কীভাবে প্রভাবিত করেছে শ্রেণিভিত্তিক বৈষম্যের জন্যে নারী অভিজ্ঞতাকে। প্রান্তিক অবস্থানে থাকা দেশগুলির (অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল বা পরাধীন) নারীদের অভিজ্ঞতা, এই তত্ত্বের নিরিখে, অবশ্যই স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকা দেশগুলির (অর্থনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণকারী) নারীদের থেকে। ফলে বিশ্বব্যবস্থা যেহেতু 'উন্নত' ও 'অনুন্নত' অঞ্চলে বিভাজিত—তাই অনুন্নত অঞ্চলের নারীরা অনেক বেশি বৈষম্যের শিকার (ওয়ার্ড, ১৯৯০)।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা প্রচলিত মার্ক্সবাদে যেসব বিষয়গুলি উপেক্ষিত হয়েছে, সেগুলির দিকে আলোকপাত করেছেন। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা তাদের চিন্তাধারার মৌলিক সূত্রগুলি গ্রহণ করেছেন মার্ক্সবাদ থেকে এবং সেগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্বের ওপর এঁদের আস্থা থাকলেও এঁরা পিতৃতন্ত্রকে কোনও শাশ্বত ব্যবস্থা বলে মনে করেন না। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা মনে করেন, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদন ব্যবস্থার বদল ঘটলে সেই সঙ্গে নারী-পুরুষের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। (ভেরোনিকা বীচি, ১৯৭৯)।[৭] এঁদের মতে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে পিতৃতন্ত্রের সংযোগ থাকলেও, এই সম্পর্ক কার্যকারণ সম্পর্ক নয়। এই দুটি ছাড়া আরও অন্য ও ভিন্ন ধরনের শক্তি (যেমন মতাদর্শ) নিয়ন্ত্রণ করে পিতৃতন্ত্রকে। এছাড়া, পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি ঘটলেই যে পিতৃতন্ত্রের অবসান হবে এরকম ভাবার কোনও কারণ নেই। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা মনে করেন যে, মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকেরা পরিবার, প্রজনন ও গার্হস্থ্য শ্রমের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিকে তেমন গুরুত্ব দেন নি তাঁদের আলোচনায়, তাই এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির ওপর আলোকপাত করা জরুরি। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী মেরী ও'ব্রায়েন (১৯৭৯) বলেছেন মার্ক্সীয় তত্ত্ব নারীর প্রজনন প্রক্রিয়া অনুধাবনের ক্ষেত্রে যথাযথ নয় কারণ যে কোনও ব্যবস্থার ভেতরে প্রজননের সঠিক অবস্থান মার্ক্স নির্দেশ করেন

Scanned with CamScanner

নি এবং পরিবারের অবস্থান কোথায়—কাঠামোয় (structure) না উপরিকাঠামোয় (superstructure)—সে সম্পর্কেও কিছু বলেননি।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারীর অবস্থানের বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণে উপস্থাপন করেছেন। বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক তাত্ত্বিক জিলা আইজেনস্টাইন (১৯৭৯) মনে করেন, নারী শোষণের কেন্দ্রীয় উপাদান হলো দুটি—পুরুষের আধিপত্য ও পুঁজিবাদ।[৮] পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারী দুভাবে শোষিত হয়—একদিকে পুঁজিবাদী শ্রম প্রক্রিয়ার শোষণে, অন্যদিকে পিতৃতান্ত্রিক লিঙ্গ-বৈষম্যের শোষণে। তাঁর মতে, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বদলে গেলেও পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় নারীর প্রতি বৈষম্য অব্যাহত থাকে, কারণ পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা বিভিন্ন সমাজে বিদ্যমান, পুঁজিবাদী সমাজ যার মধ্যে অন্যতম।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ সমর্থন করেছেন "দ্বৈত-ব্যবস্থা" (dual system) তত্ত্বকে, তাঁরা মার্ক্সীয় মডেলে পিতৃতন্ত্রের কাঠামো (base/structure) ও উপরিকাঠামোর (super structure) ধারণা গড়ে তুলেছেন। এঁদের মতে, নারীর ওপর শোষণ ও নিপীড়নের উৎস হচ্ছে দুটি : বস্তুগত কাঠামো (অর্থনৈতিক) এবং পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো (উপরিকাঠামো), যার কোনটির ওপরেই নারীর নিয়ন্ত্রণ নেই। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী হেইডি হার্টম্যান (১৯৯৭) তাঁর সাহসী নিবন্ধ "The Unhappy Marriage of Marxism & Feminism : Towards a More Progressive Union"[৯]-এ পিতৃতন্ত্রের বস্তুগত ভিত্তির বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর মতে, পিতৃতন্ত্র গড়ে ওঠে গণপরিসরে নারীর শ্রমশক্তি ও যৌনতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্যক্তি পরিসরে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে। গণপরিসরে তারা কম মজুরিতে কর্মে নিযুক্ত হয় এবং ব্যক্তি পরিসরে তারা মজুরিহীনভাবে গার্হস্থ্য কর্ম সম্পাদন করে—যার কোনও বিনিময় মূল্য নেই। তাই নারীর অবস্থা তুলনীয় হচ্ছে প্রোলেতারিয়েতের সঙ্গে, যার শ্রম ব্যবহৃত হয় তাদের দ্বারা, যাদের হাতে ন্যস্ত থাকে উৎপাদনের মাধ্যম। ফলে পিতৃতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে এক ধরনের যোগসূত্র গড়ে ওঠে। পিতৃতন্ত্র শ্রেণি নির্বিশেষে সমস্ত পুরুষকে একই দলভুক্ত করতে এবং নারীর শ্রম ও যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তাহলে কীভাবে পিতৃতন্ত্রের অবসান সম্ভব? এর উত্তরে হার্টম্যান বলেছেন—"সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী হিসেবে আমাদের এমন কর্মসূচি সংগঠিত করা দরকার, যা একাধারে পিতৃতন্ত্র-বিরোধী ও পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের দিক নির্দেশ করতে পারবে। আমরা এমন এক সমাজ গড়ে তুলতে চাই যেখানে নারী-পুরুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আমাদের মুক্ত করবে"।

পিতৃতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিষয়টি সমর্থন করেছেন সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা; তাঁরা নারীর অধীনতার বিষয়টিকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন শ্রেণি ও লিঙ্গ-সম্পর্কের নিরিখে। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী জুলিয়েট মিচেল (১৯৭১) মনে করেন, সমাজে নারীর অবস্থান নির্ণিত হয় চারটি বিষয়ের দ্বারা—উৎপাদন, প্রজনন, সামাজিকীকরণ এবং যৌনতা। তাঁর লেখা "*Women's Estate*" নামক গ্রন্থে মিচেল বলেছেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সরিয়ে দিয়ে সেই স্থানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করলেই নারীর অধীনতার বিলুপ্তি ঘটবে না, প্রকৃত নারীমুক্তি তখনই ঘটবে যখন উৎপাদন, প্রজনন, সামাজিকীকরণ এবং যৌনতা— প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর ওপর আধিপত্যের অবসান ঘটবে। মিচেল এমন একটি সমাজ-গঠনের কথা বলেছেন, যে

Scanned with CamScanner

সমাজের ভিত্তি হবে নানামুখী সম্পর্ক, যেখানে যৌনতা ও প্রজনন পরস্পরের সম্পর্কিত নয় এবং যেখানে শুধু যৌনতার কারণেই চিরাচরিত বিবাহপ্রথার প্রয়োজন অনুভূত হবে না।[১০]

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে তাত্ত্বিক মারিয়া মীজের "The Social Origins of the Sexual Division of Labour" প্রবন্ধে (১৯৮৮)।[১১] তাঁর মতে, নারীবাদীদের মধ্যে মতাদর্শের দিক থেকে ভিন্নতা থাকলেও, নারীপুরুষের বৈষম্যময় সম্পর্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করার ক্ষেত্রে তারা ঐক্যবদ্ধ। মীজ বলেছেন, 'এই সম্পর্কের সামাজিক উৎস-অনুসন্ধান নারীমুক্তির রাজনৈতিক রণনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। নারী-পুরুষের বৈষম্যমূলক সম্পর্কের ভিত্তি ও কার্যপ্রণালী ঠিকমত বুঝে না নিলে তা কখনও-ই অতিক্রম করা সম্ভব নয়'। নারী ও পুরুষের মধ্যে ঠিক কবে থেকে শ্রম-বিভাজন শুরু হয়েছে মীজ সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন নি। তিনি অনুধাবন করতে চেয়েছেন, কীভাবে এই শ্রম-বিভাজন আধিপত্য ও শোষণের সম্পর্কে রূপান্তরিত হলো এবং কেন সেই সম্পর্ক অসম ও স্তর বিভক্ত হয়ে দাঁড়ালো। মীজ বলেছেন, 'লিঙ্গ-ভিত্তিক শ্রমবণ্টনকে পরিবারের সমস্যা হিসেবে না দেখে, আমাদের উচিত সেটিকে সমাজের কাঠামোগত সমস্যা হিসেবে দেখা। নারী-পুরুষের মধ্যে স্তরবিভক্ত শ্রমবিভাজন এবং তার গতিপ্রকৃতি উৎপাদনের প্রধান সম্পর্কগুলির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়'।

মীজের মতে, প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক গুণগতভাবে স্বতন্ত্র, কারণ পুরুষ নারীর মতো নিজের দেহকে উৎপাদনশীল রূপে অনুভব করতে পারে না। নারী সন্তানের জন্মদানের মাধ্যমে যেমন নতুন জীবন সৃষ্টি করে, তেমনি মাতৃদুগ্ধের মাধ্যমে সেই জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার উপায়ও সৃষ্টি করে। উৎপাদনশীল রূপে, পুরুষের আত্মচেতনা যন্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তাই নারীর উৎপাদনশীলতা হচ্ছে পুরুষের উৎপাদনশীলতার পূর্বশর্ত। তা সত্ত্বেও কেন নারী শোষণমূলক সম্পর্ক ও লিঙ্গগত বৈষম্যের শিকার হলো? এর উত্তরে মীজ বলেছেন, শিকার-নির্ভর সমাজে শোষণের দিকটি স্পষ্ট ছিল না। পশু-পালক সমাজে নারীর গুরুত্ব হ্রাস পায়। অস্ত্রের ওপর পুরুষের অধিকার স্থাপিত হয় সেইসঙ্গে পুরুষ নিজেদের প্রজনন ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়। ফলে তখন নারী সন্তান-উৎপাদন, বিশেষত পুত্র-উৎপাদনের জন্যে, পুরুষের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। নারীর উৎপাদনশীলতা গণ্য হয় নিছক 'উর্বরতা' হিসেবে এবং তা পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে। ...পরবর্তী পর্যায়ে সমাজের নানা স্তরে গড়ে ওঠে লিঙ্গ-ভিত্তিক অসম শ্রমবিভাজন, যার ধারা অব্যাহত থেকেছে পরিবার, ধর্ম, রাষ্ট্রের মতো বিভিন্ন পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে।

বৈপ্লবিক নারীবাদ

বৈপ্লবিক নারীবাদের উদ্ভব ঘটেছিল উদারনৈতিক নারীবাদ, মার্ক্সীয় নারীবাদ ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হিসেবে। এঁরা উদারনৈতিক নারীবাদীদের মতো পিতৃতন্ত্রকে স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলে মনে করেন না। এঁদের বিশ্বাস সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণিভিত্তিক নয়, লিঙ্গভিত্তিক দ্বন্দ্ব হলো প্রধান ও প্রাথমিক দ্বন্দ্ব। এছাড়া,

Scanned with CamScanner

নারী-পুরুষের বৈষম্য জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করা যায়। বৈপ্লবিক নারীবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ দুটি ভিন্ন মানদণ্ড অনুসারে সামাজিক শ্রেণি বিভাজনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন : (১) উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভাগ এবং (২) প্রজননের সম্পর্কের ভিত্তিতে লিঙ্গগত শ্রেণিবিভাগ (শিলা জেফারি, ১৯৭৯)। জেফারির মতে, এই দ্বিতীয় ধরনের শ্রেণিবিভাগই নারীর বশ্যতার জন্য দায়ী। তাই পিতৃতন্ত্র বলতে এই দ্বিতীয় ধারার শ্রেণিবিভাজনকেই বোঝা উচিত, কারণ পিতৃতন্ত্রের অধীনেই নারীর প্রজনন ক্ষমতার ওপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে পুরুষ নারীর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।[১২] আবার নারীবাদী তাত্ত্বিক সুসান ব্রাউনমিলার (১৯৭৬) বলেছেন, পিতৃতন্ত্র নারীর জৈব গঠনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নি, বরং পুরুষের জৈব গঠনের সঙ্গেই এই ব্যবস্থা সম্পর্কিত। পুরুষ নারীকে ধর্ষণ করতে সক্ষম বলেই নারী পুরুষের বশীভূত। ধর্ষণ ক্ষমতার বলেই পুরুষ নারীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে রেখে নিয়ন্ত্রণ করে।[১৩] অনেক নারীবাদী আবার পিতৃতন্ত্রকে পুরুষের মনস্তত্ত্ব-নির্ভর বলে মনে করেন, যেমন জ্যাগারের (১৯৮৩) মতে, মনস্তাত্ত্বিক প্রভেদের কারণেই নারী ও পুরুষ দুটি ভিন্ন শ্রেণিভুক্ত। পুরুষ শাসক, তাই সে নারীকে শাসনে রাখে, ক্রমে ক্রমে তা এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

এখানে উল্লেখ্য, বৈপ্লবিক নারীবাদের প্রসার ঘটেছিল ইউরোপ ও আমেরিকায় মূলত ১৯৭০-এর দশকে। কিন্তু অনেক আগেই বৈপ্লবিক নারীবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল ফরাসী নারীবাদী সিমোন দ্য বোভয়া-র লেখা আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ "*The Second Sex*" (১৯৪৯)-এ। বোভয়া-র এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়, তখন নিজেকে তিনি সমাজতন্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, নারীবাদী আন্দোলনের কোনও প্রয়োজন নেই, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই শ্রমিক ও নারীর মুক্তি সম্ভব হবে। পরে অবশ্য তাঁর এই ধারণার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু "*The Second Sex*" গ্রন্থটিকে তাঁর নারীবাদী চিন্তার মাইলস্টোন বলা যেতে পারে—যা দু'দশক পরে বৈপ্লবিক নারীবাদীদের উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছিল। কী ছিলো এই গ্রন্থটিতে? এই গ্রন্থে বোভয়া হাজির করলেন নারীর সপক্ষে এক বিশ্বস্ত মতামত, যা গড়ে উঠেছিল নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার সমন্বয়ে। তিনি নারীকে চিহ্নিত করলেন সমাজে 'অপর' বা 'other' হিসেবে। বোভয়া-র মতে, নারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য, সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালনের কারণেই নারীর এই "অপর" বা "other" ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়। এই 'otherness' বা 'অপরত্ব' নারীর স্বাধীনতাকে সীমিত করে দেয়, ফলে নারী তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে প্রকাশ করতে পারে না। তাই বোভয়া চেয়েছেন সেইসব প্রক্রিয়াগুলিকে তুলে ধরতে, যা নারীকে 'অপর' বা 'দ্বিতীয় লিঙ্গে' পরিণত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত এই 'অপরত্ব'-র অবসান চেয়েছেন তিনি।

বৈপ্লবিক নারীবাদের আলোচনায় সিমোন দ্য বোভয়া-র অভিমত উপস্থাপনের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে; কারণ বোভয়া-র ধ্যানধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন বৈপ্লবিক নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইভা ফিগস্, জারমেইন গ্রিয়ার, কেট মিলেট, শুলামিথ ফায়ারস্টোন প্রমুখ। তবে বোভয়া-র চিন্তা-ভাবনা দ্বারা এঁরা কেবল প্রভাবিতই হন নি, তাকে আরও প্রসারিত করেছিলেন। ইভা ফিগস্ তাঁর গ্রন্থ "*Patriarchal Attitudes*" (১৯৭০) এ সরাসরি আক্রমণ করেছেন পিতৃতন্ত্রকে

Scanned with CamScanner

কারণ তাঁর মতে, নারীর অধীনতার জন্যে দায়ী হচ্ছে পিতৃতন্ত্র। সমাজের সর্বস্তরে যেমন ধর্মে, সংস্কৃতিতে, নৈতিকতায় পিতৃতান্ত্রিকতা পরিব্যাপ্ত, যা নারীকে মর্যাদাহীন অবস্থানে স্থাপন করেছে। বৈপ্লবিক নারীবাদী জারমেইন গ্রিয়ার তাঁর লেখা "*The Female Eunuch*" (১৯৭০) গ্রন্থে বলেছেন, অসমকামিতা নারীর অধীনতার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এই সম্পর্কে নারীকে কেবল পুরুষের যৌন-বাসনা চরিতার্থ করতে হয় এবং নারী হয়ে ওঠে নিষ্ক্রিয় ও পুরুষের যৌন আকর্ষণের লক্ষ্য। গ্রিয়ার (১৯৭০) তাই খোলাখুলিভাবে জানালেন, নারীর জীবনে উন্নয়নের যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রুদ্ধ হয়ে আছে, সেগুলিকে মুক্ত করতে হবে এবং নারীত্বের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মূল ধারণাগুলিকে অনুধাবন করতে শিখতে হবে।

বৈপ্লবিক নারীবাদের ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হচ্ছে নারীবাদী তাত্ত্বিক এবং নারীআন্দোলনের সক্রিয় কর্মী কেট মিলেটের লেখা "*Sexual Politics*" (১৯৬৯)। এই গ্রন্থে মিলেট কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন। মিলেটের মতে, সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে ক্ষমতা। এই ক্ষমতার কারণেই এই সম্পর্ক রাজনৈতিক, যা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে শৈশব অবস্থা থেকেই পরিবারের মধ্যে দিয়ে বাহিত হয়। এই ক্ষমতার জন্যেই নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য গড়ে ওঠে। আধিপত্য প্রকাশ পায় পরিবারের চৌহদ্দিতে এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে। পরিবারের মতো প্রাথমিক সামাজিক এককের ভিত্তি যেহেতু পিতৃতন্ত্র, তাই পিতৃতন্ত্র ও পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রকাশ পায় অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে। এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে রাষ্ট্রও। রাজনীতির চিরাচরিত সংজ্ঞাকে উপেক্ষা করে বলা হয়েছে "Personal is Political" অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাজনীতির অস্তিত্ব বোঝা যায়। সুতরাং বলা যায়এই বিখ্যাত উক্তি নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের সময়ে নারীবাদীদের কাছে জনপ্রিয় শ্লোগান হয়ে ওঠে।

বৈপ্লবিক নারীবাদী তাত্ত্বিক শুলামিথ ফায়ারস্টোন "*The Dialectic of Sex*" এ (১৯৭০) তাঁর মতামত উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও নিপীড়নের প্রধান কারণ হলো নারীর প্রজনন-ক্ষমতা। নারীমুক্তির দিশা নির্ণয় করতে গিয়ে ফায়ারস্টোন বলেছেন, গর্ভধারণ ও সন্তানজন্মদানের বোঝা থেকে নারীকে নিষ্কৃতি দিতে পারে আধুনিক উন্নত চিকিৎসাপদ্ধতি; সেক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে টেস্টটিউবের মাধ্যমে সন্তান-উৎপাদন সম্ভব। সন্তান জন্মদান ও লালনপালনের মতো দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলে সমাজে সত্যিকারের লিঙ্গ-সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

বৈপ্লবিক নারীবাদীদের মধ্যে একাংশ বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পরিবর্তে সমকামিতাকে সমর্থন করেছেন। ফলে "Lesbianism" বা 'সমকামিতা' বৈপ্লবিক নারীবাদের একটি বিশেষ সূত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বলা হয়েছে, নারীর সঙ্গে নারীর মানসিক ও যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য প্রতিরোধের একটি উপায় হয়ে উঠতে পারে '*লেসবিয়ানিজম*'। (টেইলর এবং রাপ; ১৯৯৩)। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য তাত্ত্বিক অ্যাড্রিয়েন রিচের লেখা—'Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence' (১৯৮০)। এই প্রবন্ধে রিচ সমকামিতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত তুলে ধরেছেন, যার প্রতিপাদ্য হলো অসমকাম হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া এক বাধ্যতামূলক যৌনতা, যা প্রতিটি মেয়ে

Scanned with CamScanner

কখনোই মানতে বাধ্য নয়। অন্যদিকে সমকামী মেয়েদের অস্বাভাবিক বা অসুস্থ বলে প্রচার করার মধ্যে আছে পিতৃতন্ত্রের এক ধরনের কৌশল।[১৪]

সাংস্কৃতিক নারীবাদ

পিতৃতান্ত্রিক 'জেন্ডার ডিসকোর্স' বা 'লিঙ্গ বয়ান'-এ নারী ও পুরুষের মধ্যে যে ভিন্নতার যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে, তা নারীকে চিহ্নিত করেছে পুরুষের তুলনায় দুর্বল, নিষ্ক্রিয় ও পুরুষের অধীন হিসেবে। কিন্তু নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের সময়ে এই ভিন্নতার যুক্তি নারীবাদী আলোচনায় অন্য এক সদর্থক অর্থে প্রবেশ করেছে, যাকে বলা হয়েছে 'নারী-বৈশিষ্ট্য' বা ''নারীসুলভ ব্যক্তিত্ব''। মার্গারেট ফুলার, চার্লট পারকিন্স গিলম্যান ও জেন অ্যাডামস্-এর মতো নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা এক নতুন ধরনের নারীবাদী ধারা গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের যুক্তি ছিল সহযোগিতা, পরিচর্যা, বোঝাপড়ার মতো নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী সমাজের পক্ষে বা রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয়—বিশেষ করে দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের মীমাংসার ক্ষেত্রে (ডোনাভান, ১৯৮৩)। উদারনৈতিক নারীবাদীদের সঙ্গে এরা সহমত পোষণ করে বলেছেন যে আইনি, রাজনৈতিক অধিকার ও প্রতিনিধিত্বের মতো বিষয়গুলি নারীর স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে জরুরি, কিন্তু তার পাশাপাশি বিবাহ ও যৌনতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ধারণাগুলিকে সমালোচনার দৃষ্টিতে বিবেচনা করা উচিত। সাংস্কৃতিক নারীবাদের বিশ্বাস সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ওপর। ফলে নারীর অধিকার অর্জনের প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে নারীবাদের এই নতুন ধারা নারীমুক্তির বিষয়টিকে সামাজিক সংস্কারসাধনের প্রেক্ষাপটে ভাবতে শুরু করে। (ডোনাভান ১৯৮৩)।[১৫]

মার্গারেট ফুলারের মতে, নারীর সহজাত স্বভাব হচ্ছে শান্ত, সংবেদনশীল, অহিংস—যা 'Nature' বা 'প্রকৃতি'র সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। অপরদিকে পুরুষের স্বভাব হচ্ছে আক্রমণাত্মক। তাই নারীর নিজস্ব এইসব বৈশিষ্ট্য ও গুণকে ধারাবাহিকভাবে চালনা করা প্রয়োজন, ফুলার যাকে বলেছেন "feminization of culture" বা 'সংস্কৃতির নারীত্বকরণ'—যা শেষ পর্যন্ত ভালোবাসা ও শান্তির পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। নারীর সহজাত গুণ তাকে একটি সামগ্রিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের দিকে চালিত করবে। জীবনের নানাক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলিকে একত্রিত করে তার মধ্যে সমন্বয়সাধন করার প্রবণতা দেখা দেয় এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়া নারী-জীবনের 'একমুখীনতা' কে নষ্ট করতে দেয় না।[১৬]

সাংস্কৃতিক নারীবাদী চার্লোট পারকিনস গিলম্যান সাংস্কৃতিক নারীবাদের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, তাকে সমাজতাত্ত্বিকেরা বলেছেন 'জৈবিক ব্যাখ্যা'। গিলম্যানের ধারণার মূল উৎস ছিল সামাজিক ডারউইনীয়বাদ (Social Darwinism)। গিলম্যানের মতে, প্রচলিত অর্থে ভাবা হয় যে নারীর জীবনধারণের প্রাথমিক উপায় হলো পুরুষকে আকৃষ্ট করে বিবাহ করা এবং অর্থনৈতিক নির্ভরতার জন্যে বিবাহকে টিকিয়ে রাখা। নারীজীবনের এই দিকটি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে জীবনের অন্যক্ষেত্রগুলিতে তার চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। গিলম্যান বলেছেন, বিবাহের মাধ্যমে পুরুষের ওপর নারীর নির্ভরতার বিষয়টি হচ্ছে অস্বাভাবিক, কারণ গার্হস্থ্য-কর্ম সম্পাদন ও শিশুর পরিচর্যার অর্থ এই নয় যে মানবজাতির অপর অংশ অর্থাৎ নারীকে পুরুষের ওপর নির্ভর করতে হবে। গিলম্যান বিশ্বাস করতেন, নারীর মধ্যে বিদ্যমান মাতৃত্ব, ভালোবাসা, সন্তান-

Scanned with CamScanner

প্রতিপালনের শক্তি এগুলি আবশ্যিকভাবে নারীসুলভ গুণ বা বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রয়োজন 'সামাজিক সচেতনতা' গড়ে তোলার জন্যে। বহির্জগতের রাজনীতি থেকে ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, খেলাধুলা সবক্ষেত্রেই প্রতিফলিত করে পুরুষ প্রাধান্যকে। তাই পুরুষকেন্দ্রিকতা থেকে মাতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজকে পরিবর্তিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন হলো নারী-বিপ্লবের। এই পরিবর্তিত সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলি সংগঠিত করার কাজে প্রধান প্রভাবশালী উপাদান হওয়া উচিত নারীর মাতৃত্ব। যেহেতু আমরা সামাজিক সচেতনতার এক বিশেষ কালপর্বে প্রবেশ করছি, তাই নিয়ন্ত্রণকারী সাংস্কৃতিক মতাদর্শ হিসেবে নারীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই পুরুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হবে।

পশ্চিমী সমাজে নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের সময় সাংস্কৃতিক নারীবাদীদের দ্বারা গড়ে তোলা 'ভিন্নতার' ধারণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান 'Gynocentric' (নারী-শরীরের বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রিক) নারীবাদীরা। উদারনৈতিক নারীবাদীরা সমাজে পুরুষের-সম-অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দানের মাধ্যমে নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করে তোলার দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু এই ধারার নারীবাদীরা 'ভিন্নতাভিত্তিক নারীবাদে'র কথা বললেন। এই পর্যায়ে, তাই, জনপ্রিয় শ্লোগান ছিল : যেসব নারী পুরুষের মতো সম-অবস্থান চায়, তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। নারীর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র অবস্থানের নিরিখে তারা 'ভিন্নতার' অর্থকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন এবং তাদের চিন্তা-ভাবনাকে 'Gynocentric' নারীবাদ বলে চিহ্নিত করেন (নিকলসন, ১৯৯৭)। Gynocentrist নারীবাদীদের কাছে যুক্তিবাদিতা ও সার্বজনীন মান ও আদর্শের প্রকৃতিই হচ্ছে নিপীড়নমূলক, তাই এর পরিবর্তে ভিন্নতাই উপযুক্ত উপায়। পশ্চিমী ধারার প্রচলিত চিন্তার কতকগুলি প্রধান ধারণার ওপরে Gynocentric নারীবাদ আলোকপাত করেছিল; এগুলি হলো প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে, আত্মা ও শরীরের মধ্যে এবং সার্বজনীন ও নির্দিষ্টের মধ্যে কী ধরনের প্রভেদ বিদ্যমান।

Gynocentrist তাত্ত্বিকেরা একটি সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন, সেইসঙ্গে রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদির মতো পুরুষ আধিপত্যাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে কী ধরনের মূল্যবোধ ও ক্ষমতা জড়িত তা জানতে চেয়েছিলেন। এছাড়া নারীর চিরাচরিত কাজ প্রজনন, নারীর যৌনতা, মাতৃত্ব এগুলিকে সদর্থক মূল্যবোধের উৎস হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। সুসান গ্রিফিন (১৯৮৭) বলেছেন, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে বিভাজন হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক বিভাজন এবং নারী ও প্রকৃতির সম্পর্ক নৈকট্যের। ন্যান্সি হার্টসক (১৯৮৩) এর মতে, নারী ও পুরুষের মধ্যে শ্রমের পৃথক পৃথক সামাজিক বিভাজনের কারণে দুজনের পার্থিব-দৃষ্টিকোণকে আলাদা আলাদাভাবে গড়ে তোলা হয়। পশ্চিমী সংস্কৃতির কাঠামোর ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্ককে বিভাজিত বৈপরীত্যে দেখা হয়, যেখানে একটি অপরের থেকে বেশি গুরুত্ব বহন করে। এই সংস্কৃতির অধীনে যৌনতা হচ্ছে অপরের ওপর প্রাধান্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা। স্বতন্ত্রভাবে পৌরুষ-সঞ্জাত গোষ্ঠীচেতনা প্রকাশ পায় পুরুষদের মধ্যে সেঁই সব যোদ্ধা গোষ্ঠীতে—যারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এর বিপরীতে, ঋতুমতী হওয়া, গর্ভধারণ করা, সন্তান জন্মদান করা ও শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দেওয়ার কারণে নারীর পরিসর তৈরি হয় পৃথকভাবে—তাই এই পৃথকীকরণকে দ্বিভাজন বলা যায় না—বলা যায় এই পৃথকীকরণের সঙ্গে যুক্ত পৃথক মূল্যবোধ।

Scanned with CamScanner

অপর তাত্ত্বিক সারা রাডিক (১৯৮০) মনে করেন যে Gynocentrism ধারণার প্রতি বিশ্বাসকে সম্ভাব্য নারীবাদী রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া উচিত। তাঁর মতে, জননী হিসেবে নারীর কর্তব্য ও দায়দায়িত্ব নির্বাহ করার জন্যে "মা" এই ছাপ দিয়ে তাকে আলাদা করে চিহ্নিত করা ঠিক নয় বরং সন্তান প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নারীর ভিতরে নিহিত সাংস্কৃতিক গুণাবলী প্রকাশ পায়, যা স্পষ্টতই আগ্রাসন, হিংস্রতা ও যুদ্ধবাদের বিপরীত। তাত্ত্বিক ক্যারল গিলিগান ১৯৮২ সালে প্রকাশিত তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ "In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development" এ বললেন—নারীদের আবেগ, সংবেদনশীলতা ইত্যাদি পুরুষদের থেকে স্বতন্ত্র এবং তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। তাছাড়া, যুক্তিবোধ আবেগ ও অনুভূতির তুলনায় উচ্চমার্গের নয়। গিলিগানের মতামতের প্রায় সমর্থন পাওয়া যায় অপর তাত্ত্বিক ইয়ং-এর কথায়,

> " Gender differences produce two different forms of moral rationality, a masculine ethic of responsibilitity, liberation of women and the restructuring of social relations require tempering these values with the communally oriented values derived from women's ethic of care." [১৭]

তাত্ত্বিক মেরি ও' ব্রায়েন-এর মতে, সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতার জন্যেই নারীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় 'বিরামহীন সচেতনতা' (continuous consciousness), অন্যদিকে পুরুষদের মধ্যে যে সচেতনতা কাজ করে, তা দ্বৈত, স্বতন্ত্র ও বিভাজিত।[১৮] প্রখ্যাত নারীবাদী তাত্ত্বিক ন্যান্সি শোডোরো বলেছেন, প্রত্যেক সংস্কৃতিতেই মাতৃত্বের মাধ্যমে নারীর মধ্যে গড়ে ওঠে সম্পর্কভিত্তিক গোষ্ঠী সঞ্জাত প্রবণতা। শোডোরো সমাজতাত্ত্বিক ট্যালকট পারসন্সের 'বস্তুগত সম্পর্কের তত্ত্ব' (Object Relation Theory)-কে ব্যবহার করেছেন নারীর ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্যে। পারসন্সের মতে, মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং অবদমন—কোনটিই সামগ্রিকভাবে প্রাক-সামাজিক বা সম্পূর্ণভাবে জৈবিক নয়। একমাত্র সমাজের মধ্যেই মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্কেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা সংগঠিত হয় এবং সঠিক পথে চালিত হয়। নারীবাদীরা এক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলেছেন যে সামাজিক কাঠামোর মধ্যে যদি ব্যক্তিত্ব বর্ধিত হয়—তাহলে প্রতিটি সমাজে নারী ও পুরুষের ব্যক্তিত্ব কেন ভিন্ন হয়, আর কেনই বা সমাজের কাঠামোগত বিন্যাসে প্রকাশ পায় আধিপত্য ও আনুগত্যের মাধ্যমে? তাঁর বহু আলোচিত গ্রন্থ "*Reproduction of Mothering*" (1978) এ শোডোরো নারী ও পুরুষের আত্ম-বোধের (sense of self) বিষয়টিকে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করেছেন। শোডোরো'র মতে, নারী কখনওই আত্মসম্পর্কে বোধহীন হয়, কিন্তু পুরুষের থেকে স্বতন্ত্র। পুরুষের আত্মবোধ, যেখানে, স্বনিয়ন্ত্রিত, নারীর আত্মবোধ সেখানে নিয়ন্ত্রিত।

Gynocentric নারীবাদের মূল বিষয় হলো—সামগ্রিকভাবে সমাজের গভীর ও ব্যাপক বিশ্লেষণ করা এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রয়োজনের বিষয়টি তুলে ধরা। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, gynocentric নারীবাদীরা নারীদের মধ্যে বিদ্যমান জাতিগত, শ্রেণীগত, পার্থক্যকে উপেক্ষা করেছেন এবং 'মাতৃত্ব' 'নারীসুলভ' 'বিরামহীন

Scanned with CamScanner

সচেতনতা'—প্রভৃতি বর্গকে ব্যবহার করে 'Woman' বা 'নারী' ধারণাকে প্রকৃতিগতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে (essentialize) চেয়েছেন।

এই নিবন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারীবাদের প্রধান ধারাগুলির সঙ্গে পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক নারীবাদ, উত্তর-আধুনিক নারীবাদ এবং পরিবেশবাদী নারীবাদ—যা নারীবাদ নিয়ে নিরন্তর গবেষণা ও চর্চারই ফলশ্রুতি। আলোচ্য গ্রন্থের অন্য নিবন্ধে ইতিমধ্যেই মনস্তাত্ত্বিক নারীবাদ এবং উত্তর-আধুনিক নারীবাদ আলোচিত, তাই বর্তমান নিবন্ধ অর্থাৎ নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা'র পরিসমাপ্তি ঘটাবো পরিবেশপ্রধান নারীবাদ এর ওপর আলোকপাত করে।

পরিবেশ প্রধান নারীবাদ

ইংরাজীতে নারীবাদের অন্যতম ধারা হিসাবে "Ecofeminism" স্বীকৃতি পেয়েছে গত শতকেই। Ecofeminism এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'পরিবেশ প্রধান নারীবাদ—কারণ এই ধারায় পরিবেশ-ভাবনা ও নারীবাদ এই দুটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে 'Ecofeminism' শব্দটি ১৯৭০এর দশকে প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসী নারীবাদী ফ্রাঁসোয়াজ দোবান। এখানে উল্লেখ্য ১৯৭২ সালে দোবান "Ecology, Feminism Centre" গড়ে তোলার অংশ হিসেবে "Ecofeminism" সম্পর্কিত প্রকল্প গঠন করেন। এর ঠিক দু'বছর পরে ১৯৭৪ সালে ইউব্যনের সাড়া-জাগানো গ্রন্থ *"Feminism or Death"* প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেই "Ecofeminism" শব্দটি ব্যবহার করে তিনি বলেছেন, পরিবেশবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীর মধ্যেই রয়েছে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা। তাঁর নিজের ভাষায়, "The planet placed in the feminine will flourish for all". [১৯]

তবে 'ইকোফেমিনিজম্' বা বাংলায় যাকে বলা হচ্ছে 'পরিবেশপ্রধান নারীবাদ'—তার উদ্ভব ও বিকাশকাল হিসাবে ১৯৭০-এর দশক চিহ্নিত হলেও, এই ধরনের নারীবাদের উৎস নিহিত ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে। সেই যুগের সমাজে প্রকৃতির দেবী—"GAIA" অর্থাৎ জীবনদাত্রী এবং সৃষ্টিকর্ত্রীরূপে পূজিতা হতেন। প্রকৃতির দেবী বা GAIA পরিপ্রেক্ষিত থেকেই প্রকৃতিকে নারীর সঙ্গে এক করে দেখা হয়। কিন্তু ঐতিহ্য বা অতীত ইতিহাসের দিক থেকে পরিবেশ প্রধান নারীবাদের একটি সমৃদ্ধ প্রেক্ষাপট থাকলেও, একই সঙ্গে একটি তত্ত্ব ও প্রায়োগিক কর্মকান্ড হিসাবে নারীবাদের আলোচ্য ধারা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বিগত শতকের সত্তরের দশকে।

পরিবেশ প্রধান নারীবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হলো, প্রথমত, পিতৃতান্ত্রিক ধারণায় নারীকে প্রকৃতির সাপেক্ষে এবং পুরুষকে সংস্কৃতির সাপেক্ষে চিহ্নিত করা হয়। ভাবা হয়, সংস্কৃতির অবস্থান যেহেতু প্রকৃতির থেকে উচ্চমর্যাদায়, তাই পুরুষ নারীর থেকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন। দ্বিতীয়ত, নারীর ওপরে যেভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়, নিপীড়ন চালানো হয় অনুরূপভাবে প্রকৃতিও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও নিপীড়নের শিকার হয়। তৃতীয়ত, মনে করা হয় নারী ও প্রকৃতির ওপরে শোষণ ও নিপীড়ন চালানোর মধ্যে যেহেতু সাদৃশ্য আছে, তাই নারী প্রকৃতিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। পরিশেষে, নারীবাদী আন্দোলন ও পরিবেশ আন্দোলন উভয়েরই উদ্দেশ্যের দিক থেকে সাদৃশ্য আছে। দু'ধরনের আন্দোলনই চায় সাম্যভিত্তিক ও বৈষম্যহীন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে।

Scanned with CamScanner

পরিবেশবাদী তাত্ত্বিক মারিয়া মীজ এবং বন্দনা শিবা তাঁদের লেখা "*Ecofeminism*" গ্রন্থে (১৯৯৩) পরিবেশবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নারীর ভূমিকাকে যুক্ত করে তাঁদের অভিমত ব্যাখ্যা করেছেন। এঁদের মতে, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিনাশাত্মক প্রবণতার ভিত্তি হচ্ছে যুগপৎভাবে নারী ও প্রকৃতির ওপরে ঔপনিবেশিক আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস। এই ধরনের প্রবণতা, সাম্প্রতিককালে, উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও আধুনিকীকরণের জন্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলশ্রুতি হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমশ অবনমন।[২০]

নারী এবং প্রকৃতি বা পরিবেশের মধ্যে বিদ্যমান সাযুজ্য বা সাদৃশ্যের বিষয়টিকে উপস্থাপন করতে গিয়ে মারিয়া মীজ এবং বন্দনা শিবা তাঁদের গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে সারা পৃথিবীতেই পরিবেশের বিষয়ে নারীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন দেশের নারীরা তাদের ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও পরিবেশরক্ষা আন্দোলনে সাড়া দিয়েছেন এবং শামিল হয়েছেন প্রতিবাদে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, দক্ষিণ পশ্চিম জার্মানীতে কৃষক রমণীরা পরমাণু-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। ভারতে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে মেধা পাটকরের ভূমিকার কথাও উল্লেখযোগ্য। পরিবেশরক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের এই আন্দোলনগুলিই "ইকোফেমিনিজমের" ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

এখানে উল্লেখ্য, বিগত শতকের সত্তরের দশকে পরিবেশপ্রধান নারীবাদের ওপর গভীরভাবে আলোকপাত করেন পশ্চিমী দেশগুলির শ্বেতাঙ্গ মহিলারা। পরবর্তী দশকে অর্থাৎ আশির দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশে এই পরিবেশ সচেতনতার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে বিশিষ্ট পরিবেশ তাত্ত্বিক বন্দনা শিবা 'পরিবেশপ্রধান নারীবাদের' ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। মারিয়া মীজ ও বন্দনা শিবা তাঁদের গ্রন্থ "*Ecofeminism*" এ পুঁজিবাদী পিতৃতান্ত্রিকতা কীভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কৌশল গ্রহণ করছে, সেই বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। তাঁরা পশ্চিমী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বিকল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন। বন্দনা শিবা তাঁর গ্রন্থ "*Staying Alive*" (১৯৮৯) এ তৃতীয় বিশ্বের নারীদের সপক্ষে বলেছেন, "তৃতীয় বিশ্বের নারীরা মানুষের ইতিহাসের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বেঁচে থাকার মূল প্রশ্নটিকে উপস্থাপন করেছেন। সবাইয়ের জীবনধারণের সুরক্ষার সুযোগবৃদ্ধি করে তারা প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যেকার নারীবাদী আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করতে চান, যার মাধ্যমে প্রকৃতির সংরক্ষণকারী ও দানকারী প্রবণতা বজায় থাকে।" এই গ্রন্থেই শিবা জানিয়েছেন, পরিবেশ ও নারী সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনার অনুপ্রেরণা হিসাবে প্রায় শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন ভারতের কৃষক ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত বহু নারী।[২১]

এখানে উল্লেখ করা সংগত যে, বন্দনা শিবার নারী ও পরিবেশ সম্পর্কিত অভিমত তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। এই সমালোচনায় বলা হয়েছে, বন্দনা শিবা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "*Staying Alive*"-এ ভারতে জাত ব্যবস্থার বিষয়ে কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নি। কিন্তু এই বিষয়টি সুবিদিত যে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে লিঙ্গ ও শ্রেণি ধারণার সঙ্গে জাতব্যবস্থার একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।[২২] এই বিষয়ে গ্যাব্রিয়েল ডিয়েট্রিচ মন্তব্য করেছেন, বন্দনা শিবা এবং মারিয়া মীজ উভয়েই পশ্চিমী, আধুনিক ধারণার মাধ্যমে পিতৃতন্ত্রকে দেখতে চেয়েছেন, ফলে তাদের আলোচনায় ভারতে

Scanned with CamScanner

জাতব্যবস্থা ও পিতৃতন্ত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান সংযোগকে তারা উপেক্ষা করেছেন।[২৩]

ভারতে নারীবাদী পরিবেশ তাত্ত্বিকেরা পরিবেশ প্রধান নারীবাদের যে পশ্চিমী, প্রবরবাদী চরিত্র নির্মাণ করেছেন তারই প্রতিস্পর্ধা হিসাবে গড়ে ওঠেছে "Organic Womanism" বা " জৈবিক নারীবাদের" বিষয়। লক্ষণীয় এখানে 'নারীবাদের' পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে "Womanism" নামক বর্গ, যা জনপ্রিয় হয়েছে প্রধানত আফ্রিকার নারীবাদীদের দ্বারা। "ইকোফেমিনিজমের" সীমাবদ্ধ প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে আফ্রিকার নারীবাদীরা "Womanism"-কে একটি সম্প্রসারিত ধারণা হিসেবে তুলে ধরেন। ভারতে, পরিবেশ-ভাবনার মধ্যে জাতব্যবস্থা এবং দলিত ও আদিবাসী রমণীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যেই "Organic Womanism" বা "জৈবিক নারীবাদের" ধারণাকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই ধারণা অনুসারে, "Ecofeminism" এর "Eco" শব্দটি একটি পৌরুষব্যঞ্জক বর্গ, কারণ "Eco" শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ "Oikos" থেকে—যার অর্থ হলো "গৃহস্থ"। "Oikos"-এর ধারণার মধ্যে নিহিত হয়েছে গ্রীকদেশের পিতৃতন্ত্রের একটি প্রাচীন চিন্তা-ভাবনা। নারী ও প্রকৃতির মধ্যে প্রায় সারবাদী (essentialist) পরিচিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'পরিবেশ প্রধান নারীবাদ'—হয়তো পরোক্ষভাবে 'নারী ও "গৃহস্থ" (পুরুষ অর্থে)র মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যেই প্রয়াসী, ফলে "পরিবেশ প্রধান নারীবাদ' নিজস্ব আদর্শ বা লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়। গৃহস্থালীর দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে নারীর যে "স্বাভাবিক" দায়িত্বের কথা এই ধরনের নারীবাদ তুলে ধরতে চায়, তা শেষ পর্যন্ত নারীকে "গৃহবধূ" ইমেজের চিরাচরিত পিতৃতান্ত্রিক ফাঁদের দিকেই ঠেলে দেয়। 'পরিবেশ-প্রধান নারীবাদের' এই সারবাদী প্রবণতাকেই বিরোধিতা করে 'জৈবিক নারীবাদ' (Organic Womanism), এবং তার আলোচনার পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় দলিত, আদিবাসীসহ নিম্নবর্গের নারীদের, যারা জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে ভূমি বা প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত মিথস্ক্রিয়ায় রত।

উপসংহার

এই নিবন্ধে নারীবাদের প্রধান প্রধান ধারাগুলি আলোচিত হলো। আলোচনার বাইরে থেকে গেল হয়তো আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়। তাছাড়া, নারীবাদকে নিয়ে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশে যেভাবে চর্চা ও গবেষণা হচ্ছে, তার ফলে নারীবাদের আলোচনার পরিধিও বিস্তৃত হচ্ছে, নারীবাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ। আর্থ-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নারীবাদকে নতুনতর মাত্রা যোগ করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টাও করা হচ্ছে। হয়তো সেসব বিষয় নারীবাদের মূল ধারার সঙ্গে আলোচিত হবে আগামী দিনে।

Scanned with CamScanner